# জলবায়ু সহনশীল স্বাস্থ্যব্যবস্থা

সেলিনা আক্তার

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এখন শুধু পরিবেশ নয়, মানুষের জীবনযাত্রা ও জনস্বাস্থ্যের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রবাহ, জল-মাটি-বাতাসের দূষণ ও নতুন সংক্রমণজনিত রোগের বৃদ্ধি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ক্রমে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন, তীব্র তাপপ্রবাহ এবং জ্বালানি সংকট যৌথভাবে জনস্বাস্থ্য, শ্রম উৎপাদনশীলতা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য চরম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জলবায়ু সহনশীল স্বাস্থ্যসেবা বলতে এমন একটি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বোঝায়, যা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ, রোগব্যাধি ও পরিবেশগত ঝুঁকির মধ্যেও কার্যকরভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে সক্ষম থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারে। অর্থাৎ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রবাহ, অতিবৃষ্টি, খরা বা লবণাক্ততার মতো জলবায়ুগত প্রভাবের কারণে স্বাস্থ্যখাত যেন ভেঙে না পড়ে, বরং মানুষের চিকিৎসা, জরুরি সেবা, রোগ প্রতিরোধ ও জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে—এটাই জলবায়ু সহনশীল স্বাস্থ্যসেবার মূল লক্ষ্য।

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মূল্যায়নে দক্ষিণ এশিয়াকে অন্যতম জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশ চরম তাপমাত্রা ও জীবিকা সংকটের বড়ো চাপ বহন করছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ইতিহাসের অন্যতম তীব্র তাপপ্রবাহের মুখোমুখি হয় এবং ২০২৬ সালেও উচ্চ তাপমাত্রার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। এ পরিস্থিতি জনস্বাস্থ্য, শ্রম উৎপাদনশীলতা ও অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ২০২৪ সালে তাপজনিত স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে প্রায় ২৫ কোটি কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়, যার ফলে দেশের অর্থনীতিতে প্রায় ১৭৮ কোটি মার্কিন ডলারের ক্ষতি হয়েছে, যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ০.৪ শতাংশ।

জলবায়ু পরিবর্তন, ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রবাহ এবং খরা সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে মানুষের স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে তাপপ্রবাহ ঘটছে, যা হিট স্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন,পানিশূন্যতা এবং তাপঘাতের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। উষ্ণ আবহাওয়া হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট এবং কিডনি জটিলতাগুলোকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। অতিরিক্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা শ্রমজীবী মানুষের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ঝড়ের আঘাতে সরাসরি আঘাতজনিত জখম বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। ঘূর্ণিঝড়ের পর বিশুদ্ধ পানির অভাব ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় ডায়রিয়া, কলেরা এবং চর্মরোগের মতো পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। খরার কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়, যা খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে নারী ও শিশুরা বেশি অপুষ্টিতে ভোগে। খরা কৃষকদের জীবিকার ওপর আঘাত হানে, যার ফলে তারা ব্যাপক আর্থিক অনিশ্চয়তা, হতাশা এবং মানসিক চাপে (Eco-anxiety) ভোগেন।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত মশার বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। এর ফলে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জিকা ভাইরাসের প্রকোপ সারা বছরই দেখা যায়। বন্যা, খরা ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টির ফলে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট দেখা দেয় এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এতে কলেরা, ডায়রিয়া, টাইফয়েড এবং হেপাটাইটিস-এর মতো পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত দাবদাহ এবং বায়ুদূষণের কারণে বাতাসে ক্ষতিকর কণা ও পরাগরেণুর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে হাঁপানি (অ্যাজমা) এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্টজনিত

রোগের প্রকোপ বাড়ছে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পরিবেশগত আর্দ্রতা পরিবর্তিত হচ্ছে, যা মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ চিকিৎসা সরঞ্জাম, ওষুধ, টিকা ও গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানির সংকট, যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়া এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হয়। একই সঙ্গে পানিবাহিত ও মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি এবং প্রসূতি মায়েদের জরুরি চিকিৎসায় বিঘ্ন ঘটায় জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। এ সময় দুর্যোগকালীন জরুরি স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা হয়।

দুর্যোগকালীন জরুরি স্বাস্থ্যসেবা একটি জীবনরক্ষাকারী ব্যবস্থা, যা বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প বা মহামারির মতো সংকটময় পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসাসেবা প্রদান, রোগ প্রতিরোধ এবং জীবন রক্ষায় কাজ করে। এ ব্যবস্থার আওতায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ২৪/৭ দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ মেডিকেল টিম গঠন করা হয় এবং জীবনরক্ষাকারী ওষুধ, সাপে কাটার প্রতিষেধক, স্যালাইন, টিকা ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রাখা হয়। পাশাপাশি আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে বিশুদ্ধ পানি, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং গর্ভবতী মায়েদের জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়। দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহ সমন্বিতভাবে কাজ করে।

জলবায়ু সহনশীল হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র হলো এমন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, যা বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও তীব্র তাপপ্রবাহের মতো দুর্যোগের মধ্যেও নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিতে সক্ষম। এ জন্য দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো, সোলার প্যানেল ও ব্যাটারি ব্যাকআপের মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহার, এবং পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এসব উদ্যোগ স্বাস্থ্যসেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণ ও পরিবেশগত ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে।

সরকার সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, সরকারি ও বেসরকারি খাতের স্বাস্থ্যতথ্য সমন্বয়, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং মানসিক স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধীবান্ধব সেবা ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম জোরদার করছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের পরবর্তী আর্থসামাজিক পুনর্গঠন এবং ২০২৬ সালে এলডিসি উত্তরণের প্রেক্ষাপটে একটি অধিকারভিত্তিক, ডিজিটাল ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমন্বিত স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্যখাতে প্রযুক্তির ব্যবহার, আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা (আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম) এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জলবায়ু-সচেতন প্রশিক্ষণ জোরদার করা হবে।

সরকার সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, সরকারি ও বেসরকারি খাতের স্বাস্থ্যতথ্যের সমন্বয়, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং মানসিক স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধীবান্ধব সেবা ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই-পরবর্তী আর্থসামাজিক পুনর্গঠন এবং ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বড়ো ধরনের সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে জনগণ ব্যয়বহুল ও অনিরাপদ

চিকিৎসা নির্ভরতা থেকে বের হয়ে একটি অধিকতর কার্যকর ও সাশ্রয়ী ব্যবস্থার আওতায় আসতে পারে। প্রান্তিক ও দুর্গম অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যাতে কোনো জনগোষ্ঠী সেবার বাইরে না থাকে।

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি অধিকারভিত্তিক, ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞানসম্মত সমন্বিত স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার রূপরেখা প্রণয়ন করা হচ্ছে। সর্বজনীন স্বাস্থ্যসুরক্ষা (ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ) নিশ্চিত করাই এর মূল অগ্রাধিকার, যাতে প্রত্যেক নাগরিক প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা পেতে পারে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে ডিজিটাল রেকর্ড সংরক্ষণ, টেলিমেডিসিন সেবা সম্প্রসারণ এবং জরুরি স্বাস্থ্যসেবাকে আরও দ্রুত ও কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে।

জলবায়ু সহনশীল স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে স্থানীয় কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাপপ্রবাহ, বন্যা ও পানিবাহিত রোগের মতো জলবায়ুজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় স্থানীয় জনগণ, বিশেষ করে নারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ত করে ঝুঁকি মূল্যায়ন, স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বৃক্ষরোপণ, জলবায়ু-সহনশীল কৃষি এবং দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও প্রচার কার্যক্রম জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা হলেও বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা এবং সবার সম্মিলিত উদ্যোগই একটি টেকসই ও সহনশীল স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার মূল চাবিকাঠি।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার